গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২৮ ডিসেম্বর, '১২ - ৩ জানুয়ারি, '১৩ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

দিল্লির লড়াকু যুবসমাজকে সেলাম

পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে রাইসিনা হিলসে

দিল্লির ছাত্র-যুবসমাজ থেকে সাধারণ মানুষ তোমাদের সেলাম। ভারতের ইতিহাসে এক ঘোরতম আঁধার সময়ে তোমরা সূর্যের কিরণ হয়ে জাগিয়ে দিলে মানুষকে। শেখালে মানুষ হয়ে বাঁচতে হলে এই পথেই হাঁটতে হয়। কী ভাষায় ও বিশেষণে তোমাদের অভিনন্দন জানালে যথার্থ হয়, মনের আবেগ ও ভরসাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়, জানি না। তবে এ কথা বলতে পারি, গত কয়েক দিনে দিল্লির রাজপথের ছবি আমাদের আবেগে আপ্লুত করেছে, এই বিশ্বাস ও আস্থা এনে দিয়েছে যে, না, শাসক-শোষকরা দেশের মানুষের সবকিছু ধ্বংস করতে পারেনি। চরিত্র-রুচি-নৈতিকতা যেটাই যুবসমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে শক্তি দেয়, তাকে পঙ্গু ও ধ্বংস করার সহস্র আয়োজন রয়েছে দেশের সর্বত্র। কিন্তু দিল্লির যুব সমাজ জানান দিয়ে গেল, নিষ্ঠুর শাসন-শোষণ চালিয়েও, অনৈতিকতার পাঁক ছড়িয়েও কোনও দেশেই মানবতাকে পুরোপুরি ধ্বংস করা যায় না। সে জাগে, গর্জে উঠে জাগায় সমাজকে।

শ্রদ্ধা জানাই ধর্ষিতা রমণীকে। নাম স্বভাবতই অপ্রকাশিত। তাতে বাধা মানেনি মানুষের আবেগ ও শ্রদ্ধা। কেউ নাম দিয়েছেন, 'দামিনী', অর্থাৎ বিদ্যুৎ, কেউ তাকে ডাকছেন 'সিস্টার কারেজ' অর্থাৎ সাহসিনী বোন, অনেকেই ভেবেছেন 'নির্ভয়া' বোধহয় শ্রেষ্ঠ নামকরণ হবে। দেশের ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারী সমাজের যথার্থ প্রতীকে পরিণত হয়েছেন 'দামিনী'। হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষতে কষতেই তিনি খোঁজ করেছেন ঘটনার সময় তাঁর সাথী বন্ধুর, জানতে চেয়েছেন অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়েছে কি না। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের নিরপরাধ একটি ছাত্রীর এহেন ভূমিকা ব্যাপক ছাত্রসমাজের বিবেক জাগিয়ে দিয়েছে।

দিল্লি সহ সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিদিন ধর্ষণের বর্বরতা ঘটছে। তবে দিল্লির এই ঘটনায় ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, ঘরের মহিলারা পর্যন্ত বেরিয়ে এলেন কেন রাস্তায়? ২০১২ সালের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এ কথা কেউই অস্বীকার করতে পারছে না যে, ধর্ষণের এই ঘটনাটি স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে নাগরিক মনে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভের বারুদে। শাসকদল ও সরকারি গদি দখলের জন্য লালায়িত বিরোধী দলগুলির নেতারা দেশবাসীকে ক্রমাগত উন্নয়নের বাণী শোনাচ্ছেন, দেশ কী ভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে তার পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছে। এই মিথ্যাচার বছরের পর বছর শুনে চলেছে দেশবাসী। পার্লামেন্টে নারীদের উপর হিংসা বন্ধে আইন তৈরি হয়েছে, শিশুদের রক্ষার জন্য নেতারা বাণী দিচ্ছেন, আইনও হচ্ছে। কিন্তু প্রতিদিন শত সহস্র নারী ঘরে-বাইরে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েই যাচ্ছেন, অভাবী পরিবারের শিশুকন্যাসহ মেয়েরা পাচার হয়ে যাচ্ছে নারী মাংসের ব্যবসায়ীদের হাত ধরে। আর একদিকে পরিবারের ছেলে-মেয়ে ভালবেসে অসবর্ণ বিবাহ করলে, 'পরিবারের সম্মান রক্ষার' নাম করে খুন করা হচ্ছে তাদের। এ যেন বিরামহীন। বন্ধ কারখানার শ্রমিক, বেকার যুবক, ঋণভারে ন্যুব্জ নিরুপায় কৃষক আত্মহত্যার পথ নিলে শাসক নেতারা বলেন, 'ওগুলো পারিবারিক কলহের পরিণাম', দেশের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার এ জন্য কোনও দায় নেই, সরকারের দায়িত্ব নেই। কালো টাকার কারবারিরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেশের মানুষকে অভুক্ত রেখে যারা মুনাফার পাহাড়ে বসে পা দোলায়, শাসকরা তাদের হাতে মালা ও পুরস্কার দিয়ে বলেন, 'এরাই দেশের প্রগতির প্রতীক'। ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তাদের দ্রুত বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করার বদলে মন্ত্রীরা ব্যগ্র হয়ে ওঠেন 'অভিযোগ কত মিথ্যা' তার প্রচারে। ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ আগস্ট নিরাপত্তার বেস্টনিতে দাঁড়িয়ে শাসকরা ভাষণ দেন, জয়ধ্বনি করেন ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার। আর কেরোসিনের দাম বাড়িয়ে এরা এম-পি, এম-এল-দের বেতন-ভাতা-সুখ-সুবিধা ঘৃণ্য

পাঁচের পাতায় দেখুন

আহত এ আই ডি এস ও নেতা

২৩ ডিসেম্বর দিল্লির বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিতে আহত হয়েছেন দিল্লি এ আই ডি এস ও-র নেতা কমরেড প্রশান্ত। এস ইউ সি আই (সি)-র ছাত্র-যুব-মহিলারা প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের শরিক।

কমরেড অনিল সেনের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন বেশ কিছুকাল নানা রোগে অসুস্থ থাকার পর ২৪ ডিসেম্বর সকালে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে দলের সকল কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়, কমরেডরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন।

(বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়)

দিল্লির আন্দোলনের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য রাজ্যে এস ইউ সি আই (সি)

অন্ধ্রপ্রদেশ

ঝাড়খণ্ড

ওড়িশা

কোনও ধর্মের সাহায্যেই সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল হবে না বললেন বুদ্ধিজীবীরা

রাষ্ট্রের কর্ণধাররাই চায় সাম্প্রদায়িকতা যেন নির্মূল না হয়। এ তাদের হাতে শাসনের অন্যতম হাতিয়ার। ১৮ ডিসেম্বর কলকাতার মহাবোধী সোসাইটি হলে 'অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমোনি কমিটি'-র উদ্যোগে আলোচনা সভায় শোনা গেল এই কথাগুলি। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও প্রতিরোধের উপায়'। সভাপতি বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল সাম্প্রদায়িকতার শিকড় খুঁজে বের করে তাকে উপড়ে ফেলার কথা বলেন। অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, বিশিষ্ট সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, অধ্যাপিকা মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, লেখক ও সমাজকর্মী গীতেশ শর্মা, ডঃ নেহাল আহমেদ, বিশিষ্ট শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বলেন, সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে হলে নিজেদের আচার ব্যবহার এবং চিন্তা প্রক্রিয়া বদলানোর কাজ শুরু করার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার শয়তানির বিরুদ্ধে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সচেতন করতে হবে। কোনও ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে সুড়সুড়ি দিয়ে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা যায় না — একথা প্রায় সমস্ত বক্তার কথাতেই উঠে আসে। তাঁরা বলেন, ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে দেখে দেশের সমস্ত সর্বজনীন ক্ষেত্র থেকে তাকে নির্বাসন দিতে হবে।

শুধুমাত্র সভা-সমিতি মিছিল নয়, বস্তিতে বস্তিতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নানা কর্মসূচি প্রতিনিয়ত গ্রহণ করার জন্য বক্তারা প্রস্তাব দেন।

সভায় 'অল বেঙ্গল কমিউনাল হারমোনি কমিটি' পুনর্গঠিত হয়। অধ্যাপক তরুণ সান্যাল সভাপতি এবং রূপম চৌধুরী ও জুবের রব্বানী যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন।

বিধানসভায় অধ্যাপক তরুণ নস্কর

ভস্মীভূত ১৬ বিঘা বস্তির ত্রাণ প্রসঙ্গে

সন্তোষপুর স্টেশন পার্শ্বস্থ ১৬ বিঘা বস্তি গত ২০ নভেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের উপস্থিতিতেই আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ৩২৬টি পরিবারের বাড়ি পুড়ে ছাই হয় এবং চার বছরের একটি শিশু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এই মানুষগুলি এখন এই প্রবল শীতে প্রায় খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছেন। তাদের জন্য কোনও সরকারি ত্রাণ পৌঁছায়নি। ওখানকার এসডিও ত্রাণ হিসেবে তাঁদের ৪টি বাঁশ ও ১টি ত্রিপল দিতে চেয়েছিলেন। বিনিময়ে ১০ হাজার টাকার ভাউচারে সই করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এত সামান্য সাহায্যে এত টাকার ভাউচারে কেন সই করতে হবে, তা বুঝতে না পেরে বস্তিবাসীরা সই করেননি। ফলে তাঁদের কোনও ত্রাণ জোটেনি। এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক তরুণ নস্কর গত ৪ ডিসেম্বর ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকেই এই অভিযোগ পেয়ে ১১ ডিসেম্বর বিধানসভায় স্পিকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, যেন এই অসহায় ব্যক্তিদের দ্রুত ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়।

বিধানসভায় হাতাহাতি

১১ ডিসেম্বর অধ্যাপক তরুণ নস্কর বিধানসভায় বলেন, আজ সকালের অধিবেশনে সিপিএম দলের তরফ থেকে একটি মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করা ও অধ্যক্ষ কর্তৃক তা গ্রহণ না করা নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তা একেবারেই অভিপ্রেত নয়। সিপিএম সমেত অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা যেভাবে অধ্যক্ষের টেবিলের কাগজপত্র ছুঁড়ে ফেলেছেন, তাঁর মাইক ধরে টানাটানি করেছেন তা কখনই কাম্য নয়, আবার যাঁরা এই ঘটনা ঘটালেন, তাঁদের যখন শাস্তি দেওয়া হল তা প্রত্যাহারের দাবি উত্থাপনের পর বিরোধী ও শাসক দলের সদস্যরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন যা এই সভার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর। কলকাতা শহরকে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী বলে আমরা যখন গর্ব করি তখন এই শহরের বিধানসভার মধ্যে এই ঘটনা গোটা দেশের কাছে আমাদের মাথা হেঁট করে দেবে। আপনারা যাঁরা দীর্ঘদিনের সদস্য তাঁদের কাছে একজন নতুন সদস্য হিসাবে আমার বক্তব্য, এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি আইনসভায় বিতর্কে অংশগ্রহণ করব ও নির্বাচন-কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করব — এই স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু আজকের এই ঘটনা আমার স্বপ্নকে ধাক্কা দিয়েছে। আপনারা পুরানো সদস্যরা এমন লজ্জাকর ঘটনা প্রতিহত করতে কী ভূমিকা পালন করলেন, তা আমি বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, এমন অনভিপ্রেত ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তা আমাদের সবার দেখা উচিত।

আংশিক সময়ের স্কুল শিক্ষকদের বঞ্চনা প্রসঙ্গে

এই রাজ্যের প্রায় ১০-১২ হাজার আংশিক সময়ের শিক্ষক আছেন, যাঁরা ১০-১৫ বছর ধরে শিক্ষকতার কাজ করছেন। তাঁদের নিয়োগ করছে স্কুল পরিচালন সমিতি। স্কুলের ফান্ড থেকে মাসিক ৫০০-২৫০০ টাকা পর্যন্ত সাম্মানিক দেওয়া হয়। তাঁরা সকলেই যোগ্যতাসম্পন্ন ও পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের সকল দায়িত্বই তাঁদের বহন করতে হয়। অথচ সরকার তাঁদের কোনও দায়িত্ব নেয় না। তাঁদের চাকুরির কোনও নিরাপত্তা নেই শুধু নয়, শিক্ষকের স্বীকৃতিও তাঁরা পান না। যখন স্কুলগুলিতে হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য এবং এখনই এই শিক্ষকপদ পূরণ করা সম্ভব নয়, তখন সরকার তাঁদের সার্ভিস উপযুক্তভাবে নিতে পারে। আমি মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি করছি যে, তাঁদের সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হোক ও উপযুক্ত সাম্মানিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। (১২।১২।২০১২)

প্রবীণ সংগঠকের জীবনাবসান

বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকার বিশিষ্ট প্রবীণ সংগঠক কমরেড মনসুর আহমেদ ১৭ ডিসেম্বর ভোর ৪টায় বার্ধক্য ও ফুসফুসের দীর্ঘ রোগে ভুগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে পার্শ্ববর্তী এলাকার দলের কর্মী, সমর্থক, দরদি বন্ধু এবং বহু সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। উপস্থিত হন মুরারই ও নলহাটি থানার বিভিন্ন এলাকার দলের কর্মী সমর্থকরা। তাঁর আত্মীয়বর্গ মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। জননেতা কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর পক্ষে এবং জেলা কমিটির পক্ষে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক। বিভিন্ন গণসংগঠন ও নানা সংস্থা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সহস্রাধিক মানুষ চোখের জলে তাঁর অন্তিম যাত্রায় সামিল হন।

কমরেড মনসুর আহমেদ ছাত্রাবস্থায় '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। শুরু থেকে প্রতিটি কর্মসূচিতে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন এবং তার উজ্জ্বল উপস্থিতি সকলকেই আকৃষ্ট করত। পরে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁর বাড়ি মুরারই থেকে রামপুরহাট কলেজে ভর্তি হওয়ায় দলের পক্ষ থেকে সেখানে থেকেই তাকে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন থেকেই সুতীব্র আবেগ, অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠায় ভরা এক কঠোর কঠিন সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হন। অচেনা পরিবেশ, সহায়হীন প্রবল বিরুদ্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র আদর্শের শক্তি এবং নেতৃত্বের সহায়তায় একজন একজন করে কর্মী সংগ্রহ করার কাজ শুরু করেন। দিনের বেলায় কলেজ, রাত্রে কোনও না কোনও গ্রামে গিয়ে লোক বের করার কাজ — এভাবেই তিনি রামপুরহাট থানায় দলের ভিত রচনা করেন। অনাহার অর্ধাহার ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী, কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যেত না। শোষিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ, কর্মীদের প্রতি বুকভরা ভালবাসা, দায়িত্ববোধ, তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল। নিজেকে নিয়ে কখনও ব্যস্ত থাকতে সে সময় কেউই তাকে দেখেননি। এই চারিত্রিক গুণে মানুষ সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন, এমনকী বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের লোকেরাও তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারতেন না। দরদী মন, নিরলস প্রচেষ্টা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে রামপুরহাট থানায় তিনি সংগঠন গড়ে তোলায় প্রধান ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ শরীরে কাজ করতে না পারলেও মনটা তার পড়ে থাকত পার্টির সংবাদ পাওয়ার জন্য। কর্মীদের সাথে দেখা হলেই দলের খোঁজ খবর নিতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, পরামর্শ দিতেন, নেতা-কর্মীদের শারীরিক সংবাদ নিতেন। রামপুরহাট থেকে ৫/৬ কিলোমিটার দূরে মাড়গ্রামে থাকতেন। এ বছরও অশক্ত দেহে পূজা বুক স্টলে এসেছিলেন কর্মীদের উৎসাহ দিতে। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল তার গৌরবময় অতীতের এক বিশ্বস্ত সৈনিককে, এলাকার মানুষ হারাল তাঁদের অতি প্রিয়জনকে।

প্রয়াত কমরেড মনসুর আহমেদ লাল সেলাম

১১ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে এআইএমএসএস-এর সম্মেলন

ভাঙড়ে সেভ এডুকেশন কনভেনশন

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া ও স্কুল স্তরে যৌন শিক্ষা চালু করার প্রতিবাদে দেশ জোড়া আন্দোলনে সামিল হলেন পূর্ব ক্যানিংয়ের ১নং ব্লকের মানুষ। ১ ডিসেম্বর চন্দনেশ্বর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র-যুবক। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মধুসূদন পাল। বক্তব্য রাখেন তাড়দহ উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষে নির্মল সরকার, অ্যাডভোকেট লীলাময় মণ্ডল, শিক্ষক রবিউল ইসলাম। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য অরূপ গিরি। ডাঃ মধুসূদন পালকে সভাপতি এবং শিক্ষক জাবেদ আলি ঘরামি ও সুজিত নস্করকে যুগ্ম সম্পাদক করে ২৫ জনের সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ময়দায় রক্তদান শিবির

১৮ ডিসেম্বর জয়নগরের 'ময়দা জাগরণী নারী ও শিশু কল্যাণ সমিতির' পক্ষ থেকে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সম্পূর্ণ মহিলাদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় এই শিবির সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হয়। মোট ৪৬ জন রক্তদান করেন। এলাকার মহিলারা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই শিবিরে যোগ দেন। জয়নগরের বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং মহিলাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

নরেন্দ্র মোদীর 'বিপুল' জয়ের নেপথ্যে

ভারতের উন্নয়নের মুখ খুঁজতে হন্যে হয়ে সারা দেশ ঢুঁড়ে ফেলছে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম। একসময় উন্নয়নের প্রতীক হিসাবে তারা তুলেছিল অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে। হাইটেক মুখ্যমন্ত্রীর সেই ফোলানো ফাঁপানো প্রচারের বেলুন চুপসে গেছে। এরপর এসেছিল পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ফ্রন্টের নেতা ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পালা। কিন্তু সে আশাও অস্তাচলে। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর বদলে উন্নয়ন আনবে তৃণমূল, এ প্রচারও ধুলোয় লুটোচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রথম ইনিংস মুখ থুবড়ে পড়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসও প্রায় শুয়ে পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, অনাহারে ক্লিষ্ট মানুষের ক্ষোভের আগুন চাপা দিতে পুঁজিপতিদের তাই দরকার উন্নয়নের রথের নতুন সারথী। গুজরাটের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কয়েক মাস ধরে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ কারণেই। নরেন্দ্র মোদীর জয়ে কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম যেভাবে উন্নয়নের জয় বলে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছে তাতে আরও পরিষ্কার যে, জনগণকে উন্নয়নের ট্যাবলেট গেলাতে ব্যর্থ হতাশ কর্পোরেট পুঁজি এখন মোদীকে আশ্রয় করেই আবার তেড়ে ফুঁড়ে নামতে চলেছে। ইতিমধ্যেই সুকৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্ন।

পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচারিত দৈনিক মন্তব্য করে বসে আছে — উন্নয়নে রায় গুজরাটের। এমনও বলেছে যে গুজরাট যা পারল, পশ্চিমবঙ্গ তা পারছে না। অর্থাৎ উন্নয়নের কাণ্ডারি মোদীকে পর পর তিন বার জিতিয়ে গুজরাট একজন বিকাশ পুরুষকে তুলে ধরল। কিন্তু সিপিএম নেতা বুদ্ধবাবুর নামে সংবাদ মাধ্যমের দেওয়া তকমা ব্র্যান্ড বুদ্ধকে পশ্চিমবঙ্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বলে তাদের আপশোস। যদিও তাদের মনে পড়েনি এইরকম উন্নয়নের বুলি কপচেই সি পি এম সাতবার ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসেছিল। কী পেয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ?

'বিকাশ পুরুষ' মোদীর আসল রূপটি কী? তিনি কি গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় দুই হাজারেরও বেশি মানুষের হত্যার জন্য দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন? সংবাদমাধ্যমই বলছে, ভোটপ্রচারে 'মিয়া মুশারফ' বা 'মিয়া আহমেদ' বলে প্রকারান্তরে মুসলিমদের নানাভাবে ব্যাঙ্গোক্তি করেছেন মোদী। ভোটের আগে মোদী মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলেননি একথা ঠিক। কিন্তু নির্বাচনে জিতেই মোদী বলেছেন যে তিনি সংঘের একনিষ্ঠ সেবক। সংঘ অর্থাৎ আর এস এস গুজরাটকে করে তুলতে চেয়েছে 'হিন্দুত্বের পরীক্ষাগার'। তারা সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে মাথা নীচু করে মেনে নিতে বলেছে সংখ্যাগুরু হিন্দুর আধিপত্য। মোদী সুকৌশলে বারবার এই প্রচারই করেছেন যে এই ফর্মুলা মানলে গুজরাটে থাকতে পারবে, না হলে গুজরাট ছাড়ো। এবারের নির্বাচনে বিজেপি-র ১৮২ জন প্রার্থীর মধ্যে একজনও মুসলিম সম্প্রদায়ের ছিল না।

হিন্দুত্বের পোস্টার বয় বলে খ্যাত মোদী তার সাম্প্রদায়িক হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছেন এ ভাবনা অলীক ভাবনা। বরং এইবারের ভোটে তা আরও সূক্ষ্ম অথচ জোরালো ভাবে এনেছে মোদী এবং বিজেপি। উগ্র সাম্প্রদায়িক বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, আর এস এস, বিজেপি ধর্মের সুড়সুড়ি এবং টাকা, মদ দিয়ে মস্তানবাহিনীকে মোদীর পক্ষে নামিয়েছে। অন্যদিকে আবার গুজরাটে গভীর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরিস্থিতি বিরাজ করায় সূক্ষ্ম হিন্দুত্বের জিগির শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই কাজে এমনকী বিবেকানন্দের নাম ও ছবি ব্যবহার করতেও মোদী পিছপা হননি।

এ দেশের প্রথম সারির একচেটিয়া পুঁজির মালিক মুকেশ আম্বানিদের মতে, গুজরাটকে সোনার রাজ্যে পরিণত করেছেন মোদী। সে সোনা কার সিন্দুকে ঢুকছে? মোদীর উন্নয়নের ফর্মুলায় পরিবেশ আইনকে তোয়াক্কা করা হয়নি, শিল্পপতিরা বিনা সুদে অসীম ধার পাওয়ার অধিকারী, তাদের জন্য অন্তহীন কর ছাড়, শিল্প করলে কুড়ি বছর জমির জন্য এক পয়সাও দিতে হবে না। এই মোদী জমানার তথাকথিত উন্নয়নে আর্থিক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান বেড়েছে, কমেছে মানব সম্পদ উন্নয়নের সূচক। গুজরাটের পাঁচ বছর বা তার কমবয়সী শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার ৬৯.৭ শতাংশ। রাজ্যের ২৫ শতাংশ মানুষ খালি পেটে রাত্রে ঘুমোতে যান (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮।১২) রাজ্যের প্রায় ৩২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে। (Gujrat Myth and Reality, Times of India 12-6-12, Ahmedabad Edition)

কৃষিতে গুজরাটের আয় বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু কমেছে খাদ্য শস্যের উৎপাদন। বেড়েছে বিটি তুলোর মতো বৃহৎ কৃষি লবির প্রয়োজনীয় অর্থকরী ফসলের চাষ। উন্নয়নের গুজরাটে ১৪টি জেলা খরা কবলিত। বিজেপিরই প্রাক্তন এম এল এ কানুভাই কালাসারিয়া সৌরাষ্ট্র উপকূলে শিল্পের নামে পরিবেশের ব্যাপক ধ্বংস সাধনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন।

মোদী বারংবার বলেছেন, গুজরাটে কোনও শ্রমিক অসন্তোষ নেই। বাস্তবে সে রাজ্যের সোনা, হিরে পালিশ, অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। সংগঠিত ক্ষেত্রের স্থান দখল করেছে এস ই জেড। যার ফলে শ্রমিকদের মাথা তোলার ক্ষমতাটাকেই জোর করে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। স্টেট হাঙ্গার ইনডেক্স অনুযায়ী গুজরাটের স্থান ভারতের ১৭টি বড় রাজ্যের মধ্যে ১৩ তম। মানব সম্পদ উন্নয়নসূচক অনুযায়ী আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গুজরাটে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বহুগুণ বেড়েছে। কমেছে সাধারণ মানুষের মাথাপিছু আয়। (ঐ) এই হলো উন্নয়ন চিত্র।

শিল্পায়নের জোয়ার এমন যে, ২০১১ সালে গুজরাটে সরকার মৌ সই করেছিল ৮,৩৮০;বাস্তবে শিল্প হয়েছে ২৪৩টি। তাও এমন ধরনের শিল্প, তাতে মানুষের কাজ হয় না। বিনিয়োগ যত আসবে বলেছিল এসেছে তার ১.৪ শতাংশ (এই সময়, ২১/১২)। যতটুকু বিনিয়োগ হয়েছে তা মূলত এস ই জেড এবং পুঁজি নিবিড় শিল্পে। কিছু হাইওয়ে হয়েছে, শহরের কিছু রাস্তাঘাট চকচকে হয়েছে। কিন্তু মানুষের গড় আয়ু, স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ড্রপআউট, শিক্ষার হারে গুজরাট ক্রমাগত পিছিয়ে গেছে। সাধারণ গ্রাম এবং আদিবাসী গ্রামের পরিস্থিতি আরও হতদরিদ্র দশায় পৌঁছেছে। (Gujrat Myth and Reality)

গুজরাটের মানুষকে চমক দিতে মোদী 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট' নামক প্রকল্পে একটি মার্কিন সংস্থার সঙ্গে মাসিক ২৫ হাজার ডলারে চুক্তি করেছেন। তারা নানা ভাবে মোদীর প্রচার করার দায়িত্ব নিয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে মোদী লেসার প্রযুক্তির সাহায্যে আহমেদাবাদের একটি পাঁচতারা হোটেল থেকে বক্তৃতা দিয়েছেন, যা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৮২টি মঞ্চের সামনে সমবেত জনতা দেখে মনে করেছে মোদী তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে। যে সংবাদ মাধ্যমে মোদীর জয় নিয়ে উল্লসিত তারাই লিখেছে এ যেন সিনেমার পর্দার নিখুঁত এক অভিনেতা। ঐ সংস্থার সঙ্গে চুক্তি, এই প্রযুক্তি আগামী দু'বছরের মধ্যে ভারতে আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না।

স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সাদা এবং কালো মিলিয়ে কোটি কোটি টাকা গুজরাট নির্বাচনে খেটেছে। তার জোগান এসেছে শিল্পপতিদের হাত থেকেই। যে কারণে গুজরাটের মানুষের সাথে কথা বললেই বোঝা যাচ্ছে মোদীর এহেন বিপুল জয়ে তাঁরাও অবাক। সংবাদমাধ্যম কেন এভাবে মোদীর প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ল তা তাঁদের অনেকেই ভেবে উঠতে পারছেন না। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে শিল্পপতিদের অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনে প্রভাব খাটিয়ে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে ইভিএম মেশিনে কারচুপি হয়ে থাকতে পারে। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন কোনও সময়ই মোদীর পক্ষে বিশাল ঢেউ ওঠেনি। যদিও বিজেপি আগের বছরের থেকে দুটি আসন কম পেয়েছে। তবুও মোদীর পক্ষে এই রকম দেশ জোড়া হওয়া তোলার প্রচেষ্টা মানুষকে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

ভোটে জিতলেই নেতারা জনাদেশ-এর কথা বলেন। যেন বেশি ভোট পেয়েছে বলেই তাদের সব কুকীর্তি ধুয়ে মুছে গেল। ভোট কী করে একটা দল বেশি পায় তা সারা দেশের লোকের জানতে বাকি নেই। মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার আর মিডিয়া পাওয়ারই ভোটের আসল শক্তি। জনগণ সেখানে শিখণ্ডি মাত্র। মোদীর পক্ষেও ভোট ম্যানেজ করার জন্য টাকা, মদ, মস্তানবাহিনী, আর এস এস-বিশ্বহিন্দু পরিষদের ভৈরববাহিনীর হুমকি, মিডিয়ার উচ্চগ্রামের মোদীর পক্ষে প্রচার এসব কিছু তো কাজ করেছেই, তার সঙ্গে কাজ করেছে প্রশাসনের মোদীর প্রতি নগ্ন দাসত্ব এবং শিল্পপতিদের টাকার থলি। গুজরাটের তথাকথিত নিও মিডলক্লাস বা নব্যমধ্যবিত্তদের মধ্যে যেভাবে ধর্ম ভিত্তিক মেরুকরণ করতে মোদী তথা বিজেপি সক্ষম হয়েছে তাও মোদীর পক্ষে গেছে। এবার মোদী দিল্লি জয়ের স্বপ্নের পালে অতি সুকৌশলে হাওয়া লাগাচ্ছেন। সংবাদমাধ্যম তা ফলাও করে প্রচারেও আনছে। ভাবখানা এমন যে, এসে গেছেন উন্নয়নের নতুন অবতার, যিনি তাঁর গায়ে লেগে থাকা অসংখ্য মানুষের রক্ত ধুয়ে ফেলে, মৃত্যুর কারবারি থেকে দেশের কাণ্ডারি হয়ে উঠতে চলেছেন। এই মুখোশ খুলে দিয়ে এই কর্পোরেট প্রচারের আসল রূপটি মানুষকে দেখাতে গুজরাটের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ একজোট হচ্ছেন। এস ইউ সি আই (সি)-এর গুজরাট রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকা রথের কথায় — 'এক বছরের মধ্যে দেশের মানুষ দেখবেন সারা গুজরাট জুড়ে শুরু হবে বিশাল আন্দোলন'। কোনও মিডিয়ার প্রচারে সে কথা না থাক, আন্দোলন দানা বাঁধছে গুজরাটের সাধারণ মানুষের মধ্যেই।

'সানন্দ'-এ মোদীর উন্নয়নের ফানুস ফেটে গেল

সিঙ্গুর ন্যাকি পারেনি। সানন্দ পেরেছিল। টাটাবাবুরা অভিমান করে সিঙ্গুর ছাড়লে মোদীর গুজরাট এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে লুফে নিয়েছিল ন্যানো। বিশ্বে সবচেয়ে কম দামি চার চাকার গাড়ি ন্যানোর কারখানা করতে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ টেনে নিয়ে সানন্দ জিতে গিয়েছিল। জিতে গিয়েছিল নরেন্দ্র দামোদর মোদীর 'বিকাশপুরুষ' তকমা। বাজারি সংবাদমাধ্যম প্রতিদিন 'শিল্প গেল গেল' রব তুলে দিয়েছিল। বেকারদের দুঃখে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল শিল্পপতিরা। তারা টাকার থলি নিয়ে শিল্প করবে, উন্নয়ন করবে বলে বসেছিল। সিঙ্গুরের বোকা চাষি আর পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলনকারী জনগণ বুঝলই না তাদের উন্নয়নের সদিচ্ছা! সানন্দে ন্যানোর কারখানা চালু হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী আর টাটাবাবুর হাসি হাসি মুখে হাত ধরাধরি করা পোজ তোলার জন্য সাংবাদিকদের সে কি হুড়োহুড়ি! তা দেখে সিপিএম-কংগ্রেস নেতাদরে কত না হা-হুতাশ!

সেই সানন্দ উন্নয়নের কাণ্ডারি মোদীর বিকাশপুরুষ তকমায় একেবারে কালি লেপন করে দিয়েছে। সেখানে বিজেপি প্রার্থী পরাজিত হয়েছে। উন্নয়নের ঢাক কি তাহলে সানন্দে আনন্দ এনে দেয়নি?

প্রচার ছিল, ন্যানো কারখানার জন্য ওখানকার মানুষ নাকি সাগ্রহে জমি দিয়েছিলেন। সিঙ্গুরের মতো এখানকার চাষিরা অবুঝ ছিল না। তারা নাকি প্রচুর দাম পেয়েছিল জমির। পেয়েছিল চাকরির আশ্বাস। যেমন সিঙ্গুরেও চাষিরা এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। সানন্দের বেকার যুবকরা টাটার নামী কারখানার দামি চাকরির স্বপ্নে বিভোর হয়ে মোদীর প্রচারে জমি দিয়ে দিয়েছিল। তবে জানা যায় সেখানেও সিঙ্গুরের আন্দোলনের হাওয়া নাকি লেগেছিল। কিন্তু মোদীর পুলিশ ডাণ্ডা দিয়ে সেই আন্দোলন ঠাণ্ডা করার কৃতিত্ব কুড়িয়েছিল টাটার কাছে। ২০১০ সালে যখন কারখানা চালু হল, তখন দেখা গেল কোথায় সেই দশহাজার চাকরির গল্প! জমি দাও চাকরি নাও-এর শ্লোগান হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

সানন্দের আশপাশের যে সাতটি গ্রাম আছে, সেখানকার নামমাত্র কিছু জনের চাকরি হয়েছে টাটার কারখানায়। যারা জমি দিয়েছিল সেই চাষিরা জমি বিক্রির টাকায় রোজগারের কোনও সংস্থান করতে পারেনি। চাকরিও পায়নি। জমানো টাকা বছর না গড়াতেই শেষ, কেউ কেউ জমি বিক্রির টাকায় হজ পর্যন্ত করে এসে আজ সর্বস্বান্ত। ন্যানো কারখানা লাগোয়া ছিরোড়ি গ্রামের খেতমজুর পারমার জানালেন, অনাহারে দিন কাটছে ভূমিহীন খেতমজুরদের। ন্যানোর কল্যাণে এলাকায় চাষের জমি আর নেই। কারখানার মধ্যে চলে গেছে গোচরণের জমিও। নিধরার, বোপাল গ্রামের অনেকের জমি গিয়েছে ন্যানোর কারখানায়। টাকা পেলেও চাকরি প্রায় কেউই পায়নি। স্থানীয় মানুষ ন্যানো কারখানায় কিছু নিরাপত্তারক্ষীর কাজ, ভেন্ডার পার্কে কাজ পেয়েছেন। আর কন্ট্রাকটাররা গ্রাম থেকে কিছু অনিয়মিত কর্মী নিয়োগ করেছে। তাদের মাইনেও যেমন, তেমনই কাজের স্থায়ীত্ব। কোনও দিকেই তাদের কোনও সুবিধা হয়নি।

অন্যদিকে সানন্দে বিশাল বিশাল হাইরাইজ, ঝাঁ চকচকে আবাসন, সুইমিং পুল, শপিং মল, গাড়ির শোরুম, চওড়া রাস্তা হয়েছে, বিজেপির অফিস হয়েছে সাততলা। গরিব কৃষকদের সেখানে কোনও স্থান হয়নি। তারা জমি দিয়ে আজ শহরের ঝুপড়িতে স্থান নিয়েছে। প্রায় ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। দেহাতি গৃহবধূ আলিমা বিবির কথায় জানা যায়, ছিরোড়ি গ্রাম থেকে আশপাশের দোকানে জিনিস কিনতে গেলেই বেশি দাম হাঁকে বিক্রেতারা। এই হল গুজরাটের উন্নয়ন! সিঙ্গুরের সংগ্রামী মানুষ এই উন্নয়নের ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছিল টাটাবাবুদের প্রত্যাখ্যান করে। দেরিতে হলেও সানন্দ তা বুঝেছে।

হিগস বোসন কণা আবিষ্কারের তাৎপর্য

(৩)

কিন্তু এই যে হিগস বোসন কণা, তাকে প্রচারমাধ্যম ঈশ্বরকণা বলছে কেন? এর পিছনের কাহিনীটা কৌতূহলোদ্দীপক। নোবেল প্রাইজে ভূষিত বিখ্যাত বিজ্ঞানী লিওন লেডারম্যান ১৯৯৩ সালে একটা বই লিখেছিলেন এই অধরা কণার ওপর। তাঁর দেওয়া বইটির নাম পছন্দ হয়নি প্রকাশকের। কয়েকবার নাম পরিবর্তন করেও প্রকাশকের পছন্দ না হওয়ায় 'ধুত্তোর ছাই' বলে তিনি প্রকাশককে লেখেন, যান মশাই বইয়ের নাম দিন 'Goddamn Particle'। বইটা যখন বের হল তখন দেখা গেল damn-টা কেটে প্রকাশক তার নাম করে দিয়েছেন God Particle: If the universe is the answer, What is the question? বইটা যে খুব একটা সাড়া ফেলেছিল তা নয়, কিন্তু প্রচারমাধ্যম নামটা লুফে নেয়। তারপর দেখা গেল অদ্ভুত অবস্থা — খবরের কাগজগুলো এই কণাকে ঈশ্বর কণা বলেই ডাকছে, প্রায় কখনওই হিগস বোসন বলছে না। আর বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণাপত্রে একে হিগস বোসন বলছেন, কখনই ঈশ্বর কণা বলছেন না। অথচ এঁরা সকলেই একটাই কণা সম্পর্কে বলছেন বা লিখছেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের বক্তব্যটা পৌঁছয় না। পৌঁছয় সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যটাই। ফলে তাঁদের চোখে বিজ্ঞান আর ঈশ্বর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এটাই চেয়েছিল পুঁজি নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম, চেয়েছিল জনমানসে বিজ্ঞানের বক্তব্যটা ঘুলিয়ে দিতে। বিজ্ঞানকে মিস্টিসিজমের মোড়কে পেশ করতে। তাই ঈশ্বরকণা আবিষ্কার হয়েছে — এই শিরোনাম দেখে অনেকেই ভেবেছেন এতদিনে বিজ্ঞান আর ধর্ম এক পথে এসে মিলল। গভীর বিশ্বাসীরা আরও একটু এগিয়ে ভেবেছেন, লার্জ হেড্রন কোলাইডারের সুড়ঙ্গের ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে বিজ্ঞানীরা স্বয়ং ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছেন। বিশ্বাসের কল্পনা এভাবেই ডানা মেলেছে।

বিজ্ঞানীরা নানা জায়গায় সভা করে, প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, হিগস বোসনের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে! জনগণ অবধি বিজ্ঞানীদের কথা তো পৌঁছবে সেই মিডিয়ার মাধ্যমে। তারা গড পার্টিকল ছাড়া কোনও নামে ডাকবেন না। শুধু ফুটনোটে লিখবেন হিগস বোসন। নিউজ উইক পত্রিকার এক সাংবাদিক বিখ্যাত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়াইনবার্গকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই পরীক্ষা মানুষের ধর্মবিশ্বাসের উপর কী প্রভাব ফেলবে? ওয়াইনবার্গ বলেছিলেন, বিজ্ঞান যত জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে ততই অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন কমতে থাকে। মানবসভ্যতার শুরুতে সবকিছুই ছিল ধাঁধা বা প্রহেলিকার মতো। আগুন, বৃষ্টি, জন্ম, মৃত্যু— সবই মনে হত কোনও অতিপ্রাকৃতিক হস্তক্ষেপেই ঘটছে। যত সমাজ এগিয়েছে, বিজ্ঞান এগিয়েছে, আমরা প্রাকৃতিক কারণের মধ্যেই এ সবের ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছি। ফলে ধর্মীয় ব্যাখ্যার সুযোগ বা প্রয়োজন কমেছে। বর্তমান পরীক্ষা সেই জানার পথে একটা পদক্ষেপ মাত্র। যা বলাতে চাইছিলেন তা ওয়াইনবার্গকে দিয়ে বলাতে না পেরে সাংবাদিক ঘুরিয়ে প্রশ্নটা রাখলেন — যদি এই পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষ শেষ তত্ত্বে (ফাইনাল থিয়োরি) পৌঁছতে পারে, তার মধ্যে এইসব নিয়মের সৃষ্টিকর্তা এক পরিকল্পনাকারকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না কি? ওয়াইনবার্গ উত্তরে বলেছিলেন, এই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমরা যত জানছি, এক বুদ্ধিমান পরিকল্পনাকারের ভূমিকা ততই অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে। আইজাক নিউটন মনে করতেন সূর্য কী ভাবে আলো দেয় তার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের ভূমিকা প্রয়োজন। এখন আমরা জানি সূর্যে তাপ উৎপন্ন হয় তার কেন্দ্রে হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হবার দ্বারা। যারা এখনও মহাবিশ্বের জন্ম বা বস্তুজগতের নিয়মকানুনের মধ্যে ভগবানের হাত খোঁজেন, তাঁরা আশাহতই হবেন।

আর একটা বিষয় বারবার আসছে — এরা 'ফান্ডামেন্টাল পার্টিক্‌ল্'। বিজ্ঞানীমহলেরই অনেকে বলছেন, স্ট্যান্ডার্ড মডেল যেসব কণার কথা বলে সেগুলি আর ভাঙা যায় না। অথচ বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলেই দেখা যায়, উনিশ শতকে বিজ্ঞান মনে করত পরমাণু মৌলিক কণা, অবিভাজ্য। বিশ শতকের শুরুতে যখন পরমাণুর অন্দরমহলে ঢোকা সম্ভব হল, তখন বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন — এরা মৌলিক কণা, অবিভাজ্য। আজ যখন প্রোটন, নিউট্রনের ভিতরে ঢোকা সম্ভব হয়েছে, তখন বিজ্ঞানীরা বলছেন কোয়ার্ক, লেপ্টন, ফোটন, গ্লুঅনরা মৌলিক কণা। কিন্তু "আজি হতে শতবর্ষ পরে" ব্যাপারটা সেইরকমই থাকবে তা বলা সঙ্গত কি?

কিন্তু সব স্তরেই একটা গঠন-একক থাকে। জীববিদ্যার অর্থে অণুই মৌলিক কণা, যা দিয়ে সব জীবদেহ গঠিত। রসায়নবিদ যখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণ খোঁজেন, তাঁর কাছে পরমাণুই মৌলিক কণা। কোয়ার্ক গ্লুঅনের তত্ত্ব তাঁর কোনও কাজে লাগে না। এভাবে দেখলে বোঝা যায়, আমার কাছে কোনটা মৌলিক কণা তা নির্ভর করছে আমি কী প্রশ্ন করছি তার ওপর। কত ক্ষুদ্র স্তরে দেখতে চাইছি তার ওপর। কিন্তু স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ কোনও নির্বিশেষ মৌলিক (অ্যাবসলিউটলি ফান্ডামেন্টাল) কিছু হয় না। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান যতদূর এগিয়েছে, দেখা গিয়েছে প্রতিটা বস্তুই ক্ষুদ্রতর উপাদান দিয়ে গঠিত। এগোতে এগোতে যদি এক জায়গায় থেমে বলি, এর ভিতরে আর কিছু নেই, তবে কোন যুক্তিতে থামব? বস্তুজগত থেকে যে সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা হল, আজ যা জানি কাল তার থেকে বেশি জানতে পারি। জানা শেষ হয়ে গেল— এমনটা কখনও ঘটেনি। বস্তুবাদী চিন্তা শেখায়, যত জানতে পারব, জ্ঞানের পরিধি যত বাড়বে তত দেখতে পাব কী কী এখনও জানি না, কী পথে এগোলে জানতে পারব।

কেউ যদি যুক্তি করেন, জানার শেষ তো থাকতেই পারে— তাহলে বলব একটা প্রাচীন গল্প। প্রাচীন গ্রিসে বিজ্ঞান এগিয়েছিল মূলত যুক্তি-তর্কের মধ্যে দিয়ে, হাতেকলমে পরীক্ষাকে মূল্য দেওয়া হত কম। সেই যুগে এক গ্রিক বিজ্ঞানী মনে করতেন বিশ্বটা অসীম, কিন্তু সবাই তা মনে করত না। কাজেই তর্ক লাগল এক সীমাবাদী বিজ্ঞানীর সঙ্গে। অসীমবাদী বিজ্ঞানী বললেন 'আচ্ছা তোমার কথাই মেনে নিলাম, চল দুজনে এখন সেই সীমায় যাই আর হাতে একটা ঢিল নিয়ে ঢিলটা ছুঁড়ে দিই। দুটো সম্ভাবনা থাকবে — হয় ঢিলটা হারিয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে প্রমাণ হবে বিশ্ব অসীম আর নাহয় ফিরে আসবে কিছুতে ধাক্কা খেয়ে, তাহলে প্রমাণ হবে আমরা শেষ সীমায় পৌঁছাইনি। আবার আমাদের চলতে হবে। তাহলে হয় ঢিলটা হারিয়ে প্রমাণ হবে বিশ্ব অসীম নয়ত আমরা চলতেই থাকব কোনদিন সীমায় পৌঁছাব না। যুক্তিটা বহু শত বছর আগের, কাজেই এর ফাঁকফোকর অনেক, তবে এটা বিশ্বের বদলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করতে পারি। আমাদের জানার শেষ আছে — বিজ্ঞানের ইতিহাস কিন্তু এ শিক্ষা দেয় না। এ চিন্তা আসছে ভাববাদী দর্শন থেকে।

বিজ্ঞান দর্শনের একটা বুনিয়াদী কথা এখানে খেয়াল করা দরকার। কোনও তত্ত্ব সঠিক মানে নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিমণ্ডলে সঠিক, সর্বক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। আবার কোনও পরীক্ষাই কোনও তত্ত্বকে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে প্রমাণ করে না। সফল পরীক্ষা ভুল তত্ত্বকে বাতিল করতে পারে মাত্র। নিউটনের তত্ত্ব প্রস্তাবিত হওয়ার পর পৃথিবীর নানা বস্তু এবং গ্রহ-তারাদের গতি পর্যবেক্ষণ করে এই তত্ত্বের সমর্থন মিলেছিল। তাতে কি প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব সর্বক্ষেত্রে সঠিক? বুধ গ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করে যখন বোঝা গেল সূর্যের অতি নিকটে অবস্থিত বস্তুর ক্ষেত্রে বাস্তব ও তাঁর তত্ত্বের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম হলেও কিছুটা ফারাক আছে তখন আইনস্টাইন নতুন তত্ত্ব খাড়া করলেন, যা অতি শক্তিশালী মহাকর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, কোনও একটা পরীক্ষা কোনও তত্ত্বকে নিঃসংশয়ে সার্বিকভাবে সঠিক বলে প্রমাণ করতে পারে না। তাই বিজ্ঞানীরা এগোন উল্টো দিক থেকে। কোনও তত্ত্ব প্রস্তাব করার সময় বিজ্ঞানীকে বলতে হয় কোন পরীক্ষার ফল কী হলে প্রমাণ হবে সেই তত্ত্ব ভুল। পরীক্ষায় সেই ফল না পাওয়া গেলে সেই তত্ত্ব একটা পরীক্ষায় পাশ করে। তত্ত্বটিকে সেই ক্ষেত্রে সঠিক ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীরা এগোতে থাকেন। কারণ কোনও ক্ষেত্রে পরীক্ষিত তত্ত্ব সেই বিশেষ ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে না। পরবর্তীকালের পরীক্ষায় তা অন্য ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য প্রতিপন্ন হতে পারে মাত্র। সেভাবেই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সিদ্ধান্ত ছিল হিগস বোসন কণা খুঁজে না পাওয়া গেলে এই তত্ত্ব নিঃসন্দেহে ভুল। কিন্তু পাওয়া গেলেই প্রমাণ হবে না এই তত্ত্ব নিঃসন্দেহে সর্বক্ষেত্রে ঠিক। আরও অনেক পরীক্ষা তাকে পেরোতে হবে। আসল কথাটা হল, পরীক্ষামূলক প্রমাণ ছাড়া বিজ্ঞানের কোনও তত্ত্বই গৃহীত হয় না — তা সে যত বড় বিজ্ঞানীর তত্ত্ব হোক না কেন। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞান গবেষণার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। কোনও পরীক্ষা টেবিলের ওপর ছোটখাট যন্ত্রপাতি দিয়েই সম্ভব। আবার কোনও পরীক্ষার জন্য হয়ত সারা পৃথিবীর দশ হাজার বিজ্ঞানীর যোগদান প্রয়োজন হয়, কোটি কোটি ডলার বা ইউরো খরচ হয়। প্রশ্ন হল, বিজ্ঞান গবেষণায় এত খরচ কি যুক্তিযুক্ত?

প্রশ্নটা অন্যভাবে বিচার করুন। ইউরোপের সার্ন গবেষণাগারে এই পরীক্ষার কাজ শুরু হবার আগে প্রস্তাব ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই যন্ত্র গড়ে তোলা হোক। ১৯৯৩ সালে মার্কিন সেনেট সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বলা হয় বিজ্ঞানের একটি পরীক্ষা করার জন্য অত টাকার বরাদ্দ করা সে দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ তার এক দশকের মধ্যেই আফগানিস্তান আর ইরাকের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খরচ করে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রস্তাবিত খরচের বহু বহু গুণ ডলার। অর্থাৎ টাকা নেই তা নয়। জ্ঞান বাড়ানোর জন্য, সত্যাসত্য যাচাই-এর জন্য টাকা খরচ করা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণির চোখে অপচয়। তারপর বিজ্ঞানীরা বহু জায়গায় দরবার করে শেষ পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যে ওই পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

এই পরীক্ষা থেকে আহরিত জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণে লাগবে কি? একটি তত্ত্বের সত্যাসত্য যাচাই না হয় হল, সাধারণ মানুষের জীবনে তা কাজে লাগবে কি? না লাগলে এত খরচ যুক্তিযুক্ত কি? এ প্রশ্নটাও তোলা হচ্ছে নানা মহল থেকে।

আসলে বিজ্ঞানে নতুন একটা দিক যখন উদ্‌ঘাটিত হয় তখনই অনেক সময় বলা যায় না তা কীভাবে কাজে লাগবে। প্রথম পদক্ষেপটা হয় কৌতূহল নিরসনের জন্যই। তার অনেক পরে হয়ত মানুষ খুঁজে পায় তার ব্যবহার। যে কম্পিউটারে এই প্রবন্ধ টাইপ এবং ছাপা হবে তা বানানো সম্ভবই হত না যদি না কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইলেকট্রনের ব্যবহারের

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির আন্দোলনের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য রাজ্যে এস ইউ সি আই (সি)

দিল্লি | দিল্লি | কর্নাটক

দিল্লির লড়াকু যুবসমাজকে সেলাম

একের পাতার পর

নির্লজ্জতায় বাড়িয়ে যান। নির্বাচনের আগে যখন কংগ্রেস-বিজেপি-সিপিএম-এর প্রার্থীদের সম্পত্তির ভগ্নাংশের হিসাব প্রকাশ পায়, দেখা যায় সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার নাম করে শত শত কোটি টাকার মালিকরা যাচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষায়।

শুধু কি তাই? দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে সমবেত হয়ে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে খোলা চিঠিতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রশ্ন তুলেছেন— আপনি কী আদৌ জানেন যে, এ দেশে প্রতি ২০ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। এখানেই না থেমে তাদের আরও প্রশ্ন— মহিলাদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ মাথায় নিয়েও যে-সংসদের সদস্য হওয়া যায়, সেই সংসদ কী সুরক্ষা করে। টেনে নামায় সমাজ সভ্যতাকে। এটাই আমরা সকল পুঁজিবাদী দেশে দেখেছি। রাজনীতিতে চরিত্র-নৈতিকতা-মনুষ্যত্বের যে অধঃপতন দেখছি, লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে সেটা কেবল অমুক দল বা তমুক নেতা নয়, যারাই সরকারে বসে বা তথাকথিত বিরোধী দলে থেকে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে না লড়ে তার সেবা করছে, তারাই অধঃপতনের পাঁকে ডুবছে ও অনুগতদের ডোবাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী দিল্লির বিক্ষোভকে শান্ত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। ছাত্র-যুবক ও সাধারণ মানুষের প্রশ্ন-রাইসিনা হিলসে সমবেত হয়ে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক যখন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখিয়ে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চাইছিল তখন জলকামান, লাঠি ও

টিয়ারগ্যাস দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করেছিল কারা — সরকারই তো। ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও তার ন্যায্য দাবিকে চরম উপেক্ষার দ্বারা ব্যর্থতার পথে ঠেলে দেওয়ার পরিকল্পনা কাদের ছিল— সরকারেরই তো। দিল্লির প্রবল শীতে জলে ভিজিয়ে ছাত্র-যুবকদের স্তিমিত করার ভাবনা ছিল সরকারের। কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হল। রাত্রির প্রবল শীতও যখন রাস্তার জমায়েতকে টলাতে পারল না, তখন সামান্য সংবেদনশীলতা থাকলে সরকারের কর্তব্য কি ছিল না ন্যায্য দাবিতে সমবেত জনতার কাছে যাওয়া, তাদের ন্যায্য দাবির সুরাহার নিশ্চয়তা দেওয়া। কিছুই করেনি সরকার। তাই ছাত্রছাত্রীরা, মহিলারা বলেছেন— আমরা এখানেই থাকব, আমরা চলে গেলেই এই সরকার সব ভুলে যাবে। এটাই দেশের মানুষের করুণ অভিজ্ঞতা। এভাবেই দিল্লির বিক্ষোভ ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নগ্ন করে দিয়েছে।

অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় বিক্ষুব্ধ জনতার। পুলিশি নিপীড়নের পাল্টা প্রতিরোধে নামে ছাত্রছাত্রীরা। পুলিশের লাঠি কেড়ে নেয়, মেয়েরা পুলিশের গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ে, ঢিল-পাটকেল ছোঁড়ে। নেমে আসে নির্মম পুলিশি লাঠি ও গ্যাস। বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় যুবক-যুবতীরা। এতেই শাসক ও একাংশের মিডিয়া 'গেল গেল' রব তুলেছে, হিংসার নিন্দায় নেমেছে, একে 'গুণ্ডামি', 'অসামাজিক ব্যক্তিদের কাজ' বলে অভিহিত করছে। রাষ্ট্র ও প্রশাসন নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের কথা না শুনুক ক্ষতি নেই, লাঠি-গ্যাস-জল দিয়ে ন্যায্য দাবির আন্দোলনে অত্যাচার চালাক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু যে মুহূর্তে এমনকী নিরস্ত্র মানুষও পাল্টা প্রতিরোধ করবে, পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়বে, তখনই তাকে হিংসা, হিংসা বলে নিন্দা করবে এক দল। যার অর্থ— মার খাও, রাষ্ট্রের রক্ষকদের বুটের তলায় পিষে মরে যাও, কিন্তু পাল্টা লড়াই কোর না। জনগণের জন্য 'অহিংসার' এই মিথ্যা বাণী ভারতের শোষিত জনতার অনেক ক্ষতি করেছে।

ভারতবাসী জানত, সামাজিক সমস্যায়, অন্যায় অবিচারের প্রতিক্রিয়ার ঐতিহ্যে দিল্লির জনসমাজ সবচেয়ে শীতল। শত ঘটনাতেও তার ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হয় না, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সামিল হয় না। সেই দিল্লির ছাত্র-যুবশক্তি যদি আজ গণপ্রতিরোধের নতুন অধ্যায় রচনা করে থাকে, তবে অবশিষ্ট ভারত এ ভাবে জাগছে না কেন? পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, কলকাতার ছাত্র-যুব সমাজের প্রশ্ন— কলকাতা কবে জাগবে? হ্যাঁ, আজ যারা মধ্য বয়সে পৌঁছেছেন, প্রবীণ হিসাবে গণ্য হন, তাঁরা দিল্লির বিক্ষোভে অবশ্যই দেখেছেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কলকাতার ছবি, ছাত্র-যুবদের সেই লড়াকু চেহারা। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গই সেদিন গণপ্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রেরণাস্থল ছিল সমগ্র ভারতবাসীর কাছে, আর শাসকদের কাছে ছিল ভয়ের নগরী। সেই কলকাতার প্রাণ ও চেতনাকে তিলে তিলে পঙ্গু করে দিয়েছেন কংগ্রেস-সিপিএম এবং এখন তৃণমূল নেতারা। যুবসমাজকে ভোটের মেশিনারিতে, চুরি-দুর্নীতিতে ফাঁসিয়ে দিয়ে, মদ-অশ্লীলতায় ডুবিয়ে তাদের যৌবনের তেজকে বিপথচালিত করেছে এরা। কিন্তু দিল্লি দেখাল, এ ভাবে শেষ করা যায় না। তাই পশ্চিমবঙ্গ আবার জাগবে, যার নমুনা দেখা গেল ২২ ডিসেম্বর ধর্মতলায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ-জমায়েতে। এরাই আগামী দিনে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পতাকা তুলবে। নারীর সম্ভ্রমহানি, ধর্ষণ থেকে জনজীবনের যাবতীয় সর্বনাশে পশ্চিমবঙ্গও বাদ নেই। পার্কস্ট্রিট, বারাসাত, মালদা সহ অসংখ্য ঘটনা প্রমাণ করেছে, একদা যে কলকাতায় ও শহরতলিতে নারীরা বেশি রাতেও নিরাপদে চলতে পারতেন, সেই কলকাতা আজ দিনের আলোতেও নারীদের নিরাপত্তা দিতে পারে না। এ রাজ্যের সামাজিক পরিবেশের এমনই হাল দাঁড় করিয়েছে শাসক দলগুলো।

এ রাজ্যের সংবেদনশীল মানুষের মুখের কথা— এ রাজ্যে কবে ছাত্র-যুব ও জনসমাজ দিল্লির মতো জেগে উঠবে। আমরা বলি, সে জন্য প্রয়োজন সংগঠিত আন্দোলন। গোটা ভারতই দাঁড়িয়ে আছে জনক্ষোভের স্তূপীকৃত বারুদের উপর। প্রয়োজন তাকে সংগঠিত আন্দোলনে রূপ দেওয়া। কে পারে? পারে উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন সংগঠিত সেই রাজনৈতিক দল, যার সুযোগ্য নেতৃত্ব আছে।

বুদ্ধিজীবী মঞ্চের প্রতিবাদ

২৪ ডিসেম্বর কলকাতার রাজপথে অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, প্রতুল মুখোপাধ্যায় সহ শত শত মানুষ

দিল্লির আন্দোলনের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য রাজ্যে এস ইউ সি আই (সি)

হরিয়ানা | পাটনা | গুজরাট | যোগমায়াদেবী কলেজ

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সুশীল বসাক (৬৪) গত ১০ নভেম্বর অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে দলের কর্মী ও পরিচিতজনরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন।

কমরেড সুশীল বসাক ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীল কর্মী ছিলেন, পার্টির মুখপত্র বিলি-বণ্টন, দাম জমা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। ছোটদের মধ্যে সংগ্রামী মন, বেশি দায়িত্ব পাওয়ার আগ্রহ দেখলে তিনি খুশি হতেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের তিনি জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম শহর সংলগ্ন সালুয়া অঞ্চলে ছাত্রজীবনের বন্ধুদের যোগাযোগকে ভিত্তি করে সংগঠন গড়ে তোলেন। অমায়িক ব্যবহার, আনন্দোচ্ছল স্বভাবের জন্য তিনি মানুষকে আকৃষ্ট করতেন।

২ ডিসেম্বর দলীয় কার্যালয়ে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিরঞ্জন মহাপাত্র ও অফিস সম্পাদক কমরেড রবি দাস। অন্যান্যরাও বক্তব্য রাখেন।

মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের দাবি পূরণের আশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সংগ্রামী সংগঠন অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্যাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে টেকনোলজিস্টদের স্থায়ী নিয়োগের দাবি আদায়ের পথে। ১৯৯৭ সাল থেকে এই পদে নিয়োগ বন্ধ করে দেয় সিপিএম সরকার। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত এই সংগঠন ১১ ডিসেম্বর ডাইরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসের নিকট ডেপুটেশনে গেলে কর্তৃপক্ষ জানান, ১৫ দিনের মধ্যে স্থায়ীপদে তারা নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেবেন। তিনি আরও বলেন, সমস্ত প্রজেক্টে নিযুক্ত ল্যাব টেকনিশিয়ানদের যাদের উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান ছিল তারা এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের ডিএলটি বা ডিএমএলটি করা কর্মচারীরা আবেদন করতে পারবেন। বয়স বাধা হলে তা বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন তাঁরা।

একই দিনে প্রজেক্ট ডাইরেক্টরকেও দেওয়া ডেপুটেশন প্রতিনিধিদের আশ্বাস দেওয়া হয় বিভিন্ন সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে ১০ বৎসর যাবৎ কর্মরত ৮০ জন কর্মীর বেতন সংক্রান্ত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর আদেশনামা দ্রুত কার্যকর করা হবে। প্রজেক্ট ডাইরেক্টর এসএসিএস-এর অন্তর্গত এম টি পর্যায়ের কর্মচারীগণের প্রাপ্য এপ্রিল থেকে জুলাই '১১, চার মাসের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।

হিগস বোসন কণা

চারের পাতার পর

সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারত। ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আবিষ্কার হয়েছিল ওই সার্ন গবেষণাকেন্দ্রেই, বিজ্ঞানীদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের জন্য। আজ তার কী জগৎজোড়া ব্যবহার! যদি আইপড যন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকেন তবে জানাই, ওইটুকু যন্ত্রে গান শোনা এবং রেকর্ড করার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে 'জায়েন্ট ম্যাগনেটোরেসিস্টেন্স' নামে পদার্থের একটি ধর্ম আবিষ্কারের ফলে। যাঁরা এটা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেননি কোনওভাবে তাঁদের আবিষ্কার ব্যবহার হতে পারে। অথচ আবিষ্কারের ২৫ বছরের মধ্যে হাতে হাতে ঘুরছে আইপড।

এক দল বিজ্ঞানী তত্ত্ব তৈরি করেন, আর এক দল সে তত্ত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করেন, আর একদল তখন চিন্তা করেন সে তত্ত্ব কীভাবে ব্যবহার করা যায়। এভাবেই বিজ্ঞান এগোয়, আর বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে সমাজও এগোয়। লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের পরীক্ষা সেই পথেই একটা পদক্ষেপ মাত্র।

আর একটা বিষয় নিয়েও ধোঁয়াশা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রচারমাধ্যম বলছে এই আবিষ্কারের দ্বারা নাকি বিগ ব্যাং তত্ত্ব সমর্থিত হয়েছে। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলি, হিগস বোসন কণার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সঙ্গে মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। যুক্তিশাস্ত্রের কথায় বলতে হবে, ব্যাপারটা যদি এমন হত যে বিগ ব্যাং তত্ত্ব সঠিক হলে হিগস বোসন কণা থাকতে বাধ্য, তাহলে হিগস বোসন কণার অস্তিত্বকে বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা যেত। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়।

মহাবিশ্বের যে রূপ আজ বিজ্ঞানীদের দূরবীনে ধরা পড়েছে তার ব্যাখ্যা হিসাবে অনেকগুলি প্রকল্প বা হাইপোথিসিস আছে। এটা ঠিক যে অনেক বিজ্ঞানীই তার মধ্যে বিগ ব্যাং তত্ত্বকেই বেশি জোরালো বলে মনে করেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বিজ্ঞানীমহল এই ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। যথেষ্ট দ্বিমত আছে, এবং এ নিয়ে গবেষণাও চলছে। আবার যারা বিগ ব্যাং তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যেও নানা রকম মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেন দেশ-কালেরই সৃষ্টি হয়েছে সেই মুহূর্তে, তার আগে কিছু নেই। প্রসারণশীল দেশ-কালের একটা সূচনা আছে, একটা জন্মমুহূর্ত আছে। সেই অবস্থায় সমস্ত বস্তু ও শক্তি এক বিন্দুতে ঘনীভূত হয়ে ছিল, তার ঘনত্ব ছিল অসীম, তাপমাত্রা অসীম। অনেকে এই সৃষ্টিমুহূর্তের ধারণাটা মানেন না, বলেন বিগ ব্যাংয়ের আগে সংকোচনের দশা ছিল। কেউ বলেন অনেক মহাবিশ্ব আছে, এক একটা বেলুনের মতো। প্রত্যেকটারই শুরু আছে, শেষ আছে, কিন্তু সবকটার শুরু এক নয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বিগ ব্যাং তত্ত্ব মানেন, কিন্তু বলেন একটু অন্য কথা। কলকাতায় দাঁড়িয়ে কেউ যদি প্রশ্ন করেন উত্তর দিকে কী আছে এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি উত্তরমেরুতে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করেন, তার কোনও উত্তর হয় কি? সেরকমভাবেই যে কোনও সময়েই প্রশ্ন করা যায়, এর আগে কী? প্রশ্নটার উত্তরও হয়। কিন্তু বিগ ব্যাং এর সম্পর্কে এই প্রশ্নটার কোনও অর্থ হয় না, যেমন 'উত্তরমেরুর উত্তরে কী' এই প্রশ্নটার কোনও অর্থ হয় না। যেমন পৃথিবীর উত্তর মেরু পৃথিবী পৃষ্ঠের অন্য কোনও বিন্দুর মতোই একটা বিন্দু মাত্র, তেমনই হকিং এর মতে, বিগ ব্যাং এর মুহূর্তও অন্য সব সময়ের মতো একটা সময় মাত্র, কোনও সৃষ্টি মুহূর্ত নয়। অর্থাৎ, মহাবিস্ফোরণের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা যে একটাই তত্ত্বের কথা বলেন তাও নয়। কিন্তু মূলত বিগ ব্যাং তত্ত্ব বলে যে, অতীতে মহাবিশ্ব অনেক সঙ্কুচিত ছিল, ঘন আর উষ্ণ ছিল। যত অতীতে যাব তত তাপমাত্রা বেশি, ঘনত্বও বেশি। আর তাপমাত্রা হচ্ছে কণাদের গড় গতিবেগের একটা পরিমাপ মাত্র। তাই উচ্চ তাপমাত্রা মানে তীব্র বেগে গতিশীল কণা, আর তাদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি। সে অবস্থায় বস্তুর চরিত্র কী রকম? লার্জ হেড্রন কোলাইডার যন্ত্রে তীব্র গতিতে কণাদের সংঘর্ষে তো সেই অবস্থাই সৃষ্টি হয়। তাই বিজ্ঞানীরা প্রশ্নটার উত্তর খুঁজেছেন ওই যন্ত্রের সাহায্যে। বিশেষ করে অ্যালিস নামক ডিটেক্টরটির উদ্দেশ্য সেটাই।

লক্ষ করুন, যদি শেষপর্যন্ত নানা যুক্তি তর্কের পর দেখা যায়, বিগ ব্যাং তত্ত্ব ভুল, মহাবিশ্বের চরিত্রের অন্য কোনও ব্যাখ্যা যদি খুঁজে পাওয়া যায়, তা হলেও "অতি উচ্চ তাপমাত্রায় বস্তুর চরিত্র কেমন?" এই প্রশ্নটা কিন্তু অবান্তর হয়ে যায় না। তাই বিগ ব্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত না করে প্রশ্নটাকে এভাবে রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

মোদ্দা কথা, লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার যন্ত্রে যে তাপমাত্রা তৈরি হয়েছে সেটা তো ২০১২ সালে এই পৃথিবীতেই তৈরি হয়েছে। সে অবস্থায় যে কণার জন্ম তা তো পৃথিবীতেই সম্ভব হয়েছে। সুতরাং সে অবস্থা বিশ্বের জন্মমুহূর্তের সময় ছাড়াও হতে পারে। কল্পিত বিগ ব্যাং ছাড়াও এই অবস্থা থাকতে পারে, সৃষ্টি হতে পারে। তাই এই কণার সৃষ্টির সাথে বিগ ব্যাং-এর কোনও সম্পর্ক নেই।

বস্তুজগতে কোনও কিছুই অকারণ ঘটে না। যা যা আমরা ঘটতে দেখি তার পিছনের কারণগুলোকেই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে বিজ্ঞান। জীবজগতে যে নানারূপ ক্রিয়াপ্রক্রিয়া, বিজ্ঞানীরা তার অন্তর্নিহিত কারণ খোঁজেন নানা জৈব অণুর ক্রিয়া বিক্রিয়ার মধ্যে। বিভিন্ন অণু পরমাণুর মধ্যে যে ক্রিয়া বিক্রিয়া রসায়নবিদেরা দেখেন, তার কারণ খোঁজেন বিভিন্ন পরমাণুর গঠন ও চরিত্রের মধ্যে। আবার পরমাণুর গঠন ও চরিত্রের কারণ বুঝতে আরও গভীরে ঢোকার প্রয়োজন হয়। এইভাবে আরও গভীরে ঢুকতে ঢুকতে আজ বিজ্ঞান যে জায়গায় পৌঁছেছে সেটাই কণা তত্ত্বের স্ট্যান্ডার্ড মডেল। ৪ জুলাই যে ঘোষণা হয়েছে, তা যদি আগামী দু'বছরে বারবার পুনঃপরীক্ষায় সমর্থিত হয় তাহলে বোঝা যাবে কণা জগতের চরিত্র বুঝতে বিজ্ঞানীরা ঠিক পথেই এগিয়েছেন, যদিও অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে।

পরীক্ষাটি সফল হলে কি আর কিছু জানার থাকবে না? মোটেই তা নয়। দেখা গেছে যখনই বিজ্ঞানীদের মধ্যে এরকম আত্মতুষ্টি, 'সব জেনে গেছি' ভাব তৈরি হয় তখনই প্রকৃতি এমন সব ধাঁধা সামনে এনে দেয় যে অনেক বুনিয়াদী ধারণারই খোলনলচে পাল্টাতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটতে পারে। বাস্তবে লার্জ হেড্রন কোলাইডারে এমন অনেক পরীক্ষা পরিকল্পিত আছে যার উদ্দেশ্য স্ট্যান্ডার্ড মডেল যার ব্যাখ্যা করতে পারে না তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া। তেমন কিছু পেলে আবার তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা কাগজ কলম নিয়ে বসবেন ব্যাখ্যা খুঁজতে, নতুন তত্ত্ব তৈরি করতে।

আসল কথা হল প্রকৃতি জগতে বৈচিত্র্য অসীম। যত আমরা জানি তত বুঝতে পারি কত কী অজানা আছে। আরও জানতে চেষ্টা করি। বিজ্ঞান এগিয়ে চলে।

(সমাপ্ত)

কুলতলিতে সিপিএম দুষ্কৃতীর হাতে দুই এস ইউ সি আই (সি) কর্মী খুন

১৮ ডিসেম্বর ভোরে ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোটর ভ্যানে যাওয়ার সময় সিপিএম আশ্রিত ক্রিমিন্যালদের নৃশংস আক্রমণে কুলতলি থানার জালাবেড়িয়া-২ অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি) কমরেড রাম

নিহত কর্মীর পরিজনদের সঙ্গে কথা বলছেন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল

সরদার (৩৫) ও কমরেড হরিদাস মণ্ডল (২৫) খুন হন। সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও সিপিএম দলের নেতারা খুন-সন্ত্রাস রাজনীতির দীর্ঘ অভ্যাসের হাত থেকে মুক্ত হতে পারেনি। এই ঘটনার কিছু দিন আগে এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামে সিপিএম নেতা ভূধর নস্করের বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে একটি অস্ত্র কারখানার হদিশ পায় ও তাকে গ্রেপ্তার করে। কুলতলির প্রতিটি অঞ্চলে এই রকম অসংখ্য অস্ত্র কারখানা সিপিএম নেতারা গড়ে তুলেছেন। ফলে সিপিএম কর্মীরা অবাধে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রামে-গ্রামে নিরীহ মানুষকে হুমকি দিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে দাবিয়ে রেখেছে। প্রতিবাদে কেউ মাথা তুললেই এইভাবে প্রতিবাদীদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ হেনে নিঃসাড়ে সরিয়ে দেয়। কিছু দিন আগে একই গ্রামে আর এক এস ইউ সি আই (সি) কর্মী সাহসী যুবক কমরেড সুনীল নস্করকে একা পেয়ে অতর্কিতে খুন করা হয়।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে দলের নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সন্ত্রস্ত গ্রামগুলি থেকে সাহসে ভর দিয়ে বহু মানুষ জড়ো হন। দলের পক্ষ থেকে শহিদ কমরেডদের মরদেহে মাল্যার্পণ করা হয়। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে পরের দিন কুলতলি বনধ ও সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। স্কুল কলেজ হাট বাজার দোকান যান-বাহন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। দলের সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল শহিদ কমরেডদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং কমরেড সুনীল নস্কর সহ তিন শহিদের জন্য নির্মিত বেদিতে মাল্যদান করেন। পরে কুলতলি থানায় গিয়ে ওসির কাছে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

২৩ ডিসেম্বর শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং সিপিএমের খুন সন্ত্রাসের রাজনীতির প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর, কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও কমরেড শান্তি ঘোষ প্রমুখ। কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার অসুস্থ শরীর নিয়েও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উচ্ছেদের আশঙ্কায় মহাত্মা গান্ধি রোডের দোকানদাররা

'উচ্ছেদ প্রতিরোধ মঞ্চ' গড়ে তুলে আন্দোলনে নেমেছেন কলকাতার ৪০,৪০/১, ৪০/২ মহাত্মা গান্ধি রোড ঠিকানার দোকানদার, ব্যবসায়ী এবং দোকান কর্মচারীরা। কয়েক হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা এই দোকানগুলির উপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি এক প্রোমোটার কোম্পানি কোনও নোটিস ছাড়াই পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে এসে সিনেমা হল সহ সমস্ত দোকান খালি করে দেওয়ার জন্য হুমকি দেয়। বলা হয় কাউকেই কোনও পুনর্বাসন বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না। ব্যবসায়ী-দোকানদাররা দাবি করেছেন, তাঁরা বৈধ কাগজপত্র নিয়েই ব্যবসা করছেন। প্রতিবাদে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের আশঙ্কা, আবার যে কোনও দিন তাঁদের উচ্ছেদের চেষ্টা হবে।

মজফফরপুরে নতুন পার্টি অফিস

৩ ডিসেম্বর বিহারের মজফফরপুরে দলীয় কার্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, দলের বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশংকর, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং, দলের প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড এন আর সিং প্রমুখ। দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন গরিব খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে পার্টি অফিসের উদ্বোধন করেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, পার্টির সমর্থক দরদী, বুদ্ধিজীবী, জনগণ-যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ফলে ঐতিহাসিক মজফফরপুরে দলের নিজস্ব অফিস প্রতিষ্ঠা সফল হয়েছে তাদের সকলকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন। অভিনন্দন জানাই এই দিনটিকে নির্বাচন করার জন্যও। আজকের দিনটি ভারতের মহান বিপ্লবী শহিদ ক্ষুদিরামের ১২৩তম জন্মদিন। মজফফরপুরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ক্ষুদিরামের নাম। এই দিনের সঙ্গে, বিপ্লবী ক্ষুদিরামের মহান সংগ্রামের সঙ্গে, স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সঙ্গে, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান ও সর্বহারা বিপ্লবী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গড়ে ওঠা অবিচ্ছিন্নভাবে ও আবেগময় ধারাবাহিকতায় জড়িত।

তিনি তাঁর আলোচনায় বিপ্লবী ক্ষুদিরামের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্মরণ করেন, ভারতবর্ষের নবজাগরণের মহান পুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আপসহীন মানসিকতা ও হতদরিদ্র মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসার কথা।

তাঁর সুদীর্ঘ আলোচনায় তিনি বলেন, ক্ষুদিরামকে ভিত্তি করে যে বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনা, তার ধারাবাহিকতায় একটার পর একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান এ দেশে ঘটেছিল বিভিন্ন সময়ে। বিপ্লবীরা কখনও বিচ্ছিন্নভাবে কখনও সংগঠিতভাবে লড়াই করেছিলেন। তার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল দুটি ধারা। একটা আপসহীন সংস্কারবাদী দক্ষিণপন্থী ধারা। আর একটা আপসহীন বিপ্লবাত্মক ধারা। ১৯২৫ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়ারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ভারতের যারা কমিউনিস্ট তাদের কর্তব্য হচ্ছে যারা বিপ্লবী তাদের সাথে ঐক্য করে আপসকামী বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে শ্রমিক কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সংগঠিত করা। এই শিক্ষা নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচিত পার্টিটি চলেনি। কারণ তারা কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর ভাষণে নেতাজীর কংগ্রেসকে ব্রিটিশ বিরোধী আপসহীন মঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগ, তার বিরুদ্ধে গান্ধিবাদীদের পন্থ প্রস্তাব, কংগ্রেস থেকে নেতাজীর বহিষ্কার, কংগ্রেসের আপসকামী গান্ধিবাদীদের নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, নেতাজীর উদ্যোগের পিছনে কমিউনিস্ট পার্টির অসহযোগিতা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোচনা করেন। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর নেতাজীর ১৯৪০ সালে বিহারের রামগড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলনে আপসহীন সংগ্রামের আহ্বান, সারা ভারতের বিপ্লবী শক্তিগুলির সমন্বয় সাধনে তাঁর উদ্যোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড শিবশঙ্কর

তিনি বলেন, এর পর ১৯৪২ সালে আগস্ট অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানেরও বিরোধিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি। অত্যন্ত অল্প সময়ে বারবার অভ্যুত্থান ঘটে। এর পর নৌ-বিদ্রোহ হয় ১৯৪৫ সালে। কিন্তু বিপ্লব সংগঠিত করার লক্ষ্যে এই অভ্যুত্থানেরও কোনওটারই সুযোগই নেওয়া যায়নি উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে। এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন নেতাজীর মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুগভীর প্রত্যয় ও শ্রদ্ধার কথা।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বিশ্বের পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংকটের ভয়াবহতার উল্লেখ করেন। উল্লেখ করেন ভারতবর্ষের নারী পাচার, নারী ধর্ষণ, দারিদ্রের ভয়াবহতার, বিশ্লেষণ করেন কংগ্রেস, বিজেপি সহ রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলির উন্নয়নের নামে পুঁজিতোষণ নীতির ভয়াবহ পরিণাম।

এই অবস্থার পরিবর্তন করতে চাই ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুকদেব, আসফাকউল্লা নেতাজীর মতো মহান চরিত্র অনুশীলন করা, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে হৃদয়ঙ্গম করা। তিনি আবেদন করেন এই অফিস সেই চিন্তার প্রকৃত চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠুক।

২১ ডিসেম্বর পৃথিবী কিন্তু ধ্বংস হল না

তবুও এত প্রচার কেন

রটেছিল '২১ ডিসেম্বর ২০১২ মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের এই বসুন্ধরা'। খবরটা প্রচারের সাথে সাথে এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পৃথিবী জুড়ে চলল যাগ-যজ্ঞ বা তারই অনুরূপ প্রার্থনা সভা। শুনে মজা লাগলেও বিষয়টা কেবলমাত্র মজাতেই সীমাবদ্ধ নেই। অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন, দ্বারস্থ হয়েছেন মনরোগ বিশেষজ্ঞদের। অনেকের রাতের স্বপ্নে হানা দিচ্ছে আতঙ্ক।

কেমন করে জানা গেল পৃথিবী ধ্বংস হবে? ধ্বংসতত্ত্বের প্রবক্তারা বলছেন, ২১ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে মায়া ক্যালেন্ডারের মহাবৃত্ত। ৫,১২৬ বছর বা ১৮,৭২,০০০ দিনের এই মায়া মহাবৃত্ত শুরু হয়েছিল ৩১৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১১ আগস্ট। অতএব সেই হিসাবে ২১ ডিসেম্বর পৃথিবীর শেষ দিন না হয়ে যায় না, কিন্তু আমাদের পরিচিত যে কোনও ক্যালেন্ডারের একটা বছর শেষ হয়ে গেলে যেমন পৃথিবী শেষ হয়ে যায় না, আর একটা নতুন বছর শুরু হয় মাত্র, তেমনই মায়া ক্যালেন্ডারের এক মহাবৃত্ত শেষ হয়ে গেলে কেন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে? বরং শুরু হবে একটি নতুন মহাবৃত্ত। তাই ঐ দিনটা গুয়াতেমালার অধিবাসীদের কাছে এক আনন্দের দিন। কারণ তাঁরা নিজেদের ঐ মায়া সভ্যতার ঐতিহ্যের অংশীদার বলে মনে করেন। প্রশ্ন উঠছে, মায়া সভ্যতার মানুষেরা মহাবৃত্তের থেকেও বড় সময় মাপার একক যথা পিকতুন, কালাবতুন, কিঞ্চিলতুন ইত্যাদি যখন জানতেন তখন আমরা কেন মহাবৃত্তেই থেমে যাব? আরও প্রশ্ন, মায়া সভ্যতার কোনও নথিতেই পাওয়া যায় না যে, তারা বলছে মহাবৃত্ত শেষ হলেই পৃথিবী ধ্বংস হবে। সুতরাং এই প্রচার নিতান্তই বুজরুকি।

ধ্বংসতত্ত্বের প্রবক্তারা গ্রহাণু বা অজানা গ্রহ নিবিরুর সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষের তত্ত্ব শুনিয়েছেন। প্রথমত, নিবিরু বলে কোনও গ্রহ সৌরমণ্ডলে নেই। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর কোনও মহাকাশ সংস্থাই কোনও গ্রহাণুর সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সংঘর্ষের পূর্বাভাস দেয়নি।

পৃথিবীর চৌম্বক মেরু পরিবর্তনের ফলে মহাপ্রলয় ঘনিয়ে আসবে বলে যে কথা বলা হয়েছে তাও সত্য নয়। কারণ ৭ লক্ষ ৮০ হাজার বছর আগে শেষবার যখন এই পরিবর্তন হয়েছিল তখন পৃথিবী ধ্বংস হয়নি। আজকের মানুষ হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্সের পূর্বপুরুষ হোমো ইরেকটাস সহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বহাল তবিয়তেই বেঁচে ছিল। আর পৃথিবীর ঘূর্ণাক্ষ পরিবর্তনের যে তত্ত্ব শোনানো হচ্ছে, তাও অসম্ভব। কারণ তার জন্য প্রয়োজন বাইরে থেকে বিপুল পরিমাণ বল, যে বলের কোনও অস্তিত্ব নেই।

সূর্যের চৌম্বক সক্রিয়তা বৃদ্ধির ফলেও পৃথিবীর কোনও বিপর্যয় হবে না। কারণ এই সক্রিয়তা প্রতি ১১ বছর অন্তর বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০০১ সালে অথবা ১৯৯০ সালে যখন সূর্যের চৌম্বক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন কিছু তড়িৎ-চুম্বকীয় যন্ত্রপাতির ক্রিয়ায় সমস্যা হয়েছিল মাত্র। পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হয়নি।

ধ্বংসের কারবারিরা বলছেন, গোটা পৃথিবী জুড়ে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে ও তার প্রতিক্রিয়ায় শেষের সে দিন আসন্ন। কিন্তু ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত যতই তীব্র হোক না কেন, সেগুলি সবসময়ই স্থানীয় ঘটনা। তার ক্ষয়ক্ষতিও পৃথিবী জুড়ে হয় না।

এই সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেন বারবার আমরা শুনি পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন? কেন এই ধরনের যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক মিথ্যা প্রচার ছড়ানো হয়? এই ভিত্তিহীন প্রচারের পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে ব্যবসা। এই সংবাদ দিয়ে যদি বাজারে বই, সিনেমা প্রকাশ করা হয় বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবসাইট খোলা হয় তবে তার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা মুনাফা কামানো যায়। জ্যোতিষী, ফেংশুই বিশারদ, তান্ত্রিক, গডম্যানদের কাছে লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। রত্ন, মাদুলি, কবচ, ধাতু ইত্যাদির বিক্রি বাড়বে। আর জুয়েলারি মালিকেরা প্রচুর অর্থ লুটবে। তার একটা অংশ কমিশনের মাধ্যমে ঐ জ্যোতিষী বা তন্ত্র বিশারদদের পকেটেও ঢুকবে।

কিন্তু এই ধরনের প্রচারের পিছনে অন্য একটি উদ্দেশ্যও রয়েছে। মানুষ আজ সমস্যায় জেরবার, জীবন অতি অনিশ্চিত। অধিকাংশের খাদ্য নেই, মাথার ওপর আশ্রয় নেই, শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই, বাড়ির মেয়েটির নিরাপত্তা নেই। ফলে মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রোধ। আর সেই ক্রোধ মাঝেমধ্যেইফেটে পড়ছে সশব্দে। সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। এশিয়া থেকে আফ্রিকা, ইউরোপ থেকে আমেরিকা সর্বত্রই একই চিত্র। আর তাই মুনাফার চূড়ায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে যারা সকলের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে তারা এই সমস্যার প্রকৃত কারণগুলিকে গোপন রেখে মানুষকে নিয়তির গল্প শোনায়, পূর্বজন্মের কর্মফলের কথা বলে, ঈশ্বরের অভিশাপে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব আওড়ায়। এই তথ্য যে মিথ্যা, যে যেখান থেকেই তত্ত্ব জন্ম দিক না কেন শেষ পর্যন্ত এই মহাপ্রলয়ের তত্ত্ব যে শোষকশ্রেণিকেই সাহায্য করে, সেটি অনুধাবন করা কঠিন নয়। শোষিত শ্রেণির স্বার্থেই তাই বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার অত্যন্ত জরুরি।

মিথ্যা গুজবের বিরুদ্ধে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি

২১ ডিসেম্বর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে — এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি বিগত ২০০৯ সাল থেকে প্রচার চালিয়ে আসছে। কায়েমি স্বার্থবাদীরা সিনেমা, বই, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে এই অপপ্রচার শুরু হয়। এর পাল্টা সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলা, ইংরেজি সহ অন্যান্য ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই বিষয়ে যুক্তি সহ বৈজ্ঞানিক মতামত তুলে ধরে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের ১৫টি রাজ্যে অসংখ্য ছোট-বড় সভা, স্লাইড-শো, তথ্যচিত্র প্রদর্শনী, বিতর্কসভা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরা হয়।এই বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। উপস্থিত ছিলেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সভাপতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, কার্যকরী সভাপতি শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স সোসাইটির ইউনিভার্সিটি (বেসু)-র প্রাক্তন রেজিস্টার অধ্যাপক প্রদীপ কুমার রায়, ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সম্পাদক ডঃ নীলেশ মাইতি এবং কৃষিবিজ্ঞানী ডঃ সফিকুল আলম। ২১ ডিসেম্বর বিশেষ দিনটিতে দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির সামনে এবং হাজরায় যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের বাইরে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শত শত মানুষ এই সভা দুটিতে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য শোনেন এবং তথ্যচিত্রটি দেখেন।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

ফেল করা ছাত্রকে পাশ করিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি এনেছে শাসকদলই

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষায় এ রাজ্যের বেশ কিছু স্কুলে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাতভর ঘেরাও করা বা স্কুলে তালা লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অনেকেই বলছেন, কী অন্যায় দাবি! শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে এই নৈরাজ্য চলতে দেওয়া যায় না। শিক্ষানুরাগী মানুষ এই ঘটনায় যুগপৎ বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন। উদ্বেগের কারণ হল, ফেল করা সত্ত্বেও পাশ করিয়ে দিলে তাতে আর যাই হোক শিক্ষা অর্জিত হতে পারে না। আরও গভীর উদ্বেগের বিষয় হল, একের পর এক স্কুলে এই অন্যায় দাবি ছড়িয়ে পড়ছে।

কী করেই বা ফেল ছাত্ররা এ দাবি তোলার কথা ভাবতে পারছে? কারা তাদের এ দাবি তোলার দিকে ঠেলে দিচ্ছে? ঠেলে দিচ্ছে তারাই যারা কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতায় বসে ঢালাও পাশ করিয়ে দেওয়ার ফরমান জারি করেছে। শূন্য পেলেও প্রমোশন আটকানো যাবে না, আটকালে শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এই তত্ত্ব যে মন্ত্রীরা-নেতারা দিবারাত্র প্রচার করছেন, তাঁরা শিক্ষায়তনে এই নৈরাজ্য সৃষ্টির দায় কি এড়াতে পারেন? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে '৭০ এর দশকের নৈরাজ্য কায়েম হয়েছে। তিনি কি ভুলে গেছেন তাঁর দলই চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ফেল করলেও পাশ করানোর নীতি গ্রহণ করেছিল এবং শিক্ষাবিদদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে গায়ের জোরে তা কার্যকর করেছিল? তিনি কি স্মরণ করতে পারেন '৬০-এর দশকে তাঁর দল বলেছিল, গণটোকাটুকি ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার? আজ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীরা হুকুম দিচ্ছেন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও ফেল থাকবে না। এঁরাই ফেল ছাত্রদের মুখে ভাষা জোগাচ্ছেন পাশ করিয়ে দেওয়ার উদ্ভট দাবি উত্থাপনের। ফলে এই নৈরাজ্যের জন্য কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতিই দায়ী। এই নীতি শুধু শিক্ষাকেই ধ্বংস করবে তা নয়, ছাত্রদেরও যে অনৈতিক পথে ঠেলবে — তা একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একেবারে শুরুতেই বলেছে এবং তা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

স্কুলকে ফেল-মুক্ত করতে হলে বা ফেল যথাসম্ভব কমাতে হলে পঠন পাঠনের যথাযথ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তার দায়িত্ব সরকারের। এজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এ রাজ্যে হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য। সেগুলি দ্রুত পূরণের কোনও ব্যবস্থা সরকার করছে না। পার্শ্বশিক্ষক-চুক্তিশিক্ষক নিয়োগ করে কোনও ক্রমে ঠেকনা দেওয়া হয়েছে। স্কুল শিক্ষা যথাযথ মানে থাকলে ফেলের সংখ্যা কমতে পারত। কিন্তু সরকার নিজদায়িত্ব পালন না করে শিক্ষার সমস্যা সমাধানের মহৌষধি হিসাবে ফেল তুলে দেওয়ার যে সংস্কৃতি এনেছে অবিলম্বে তা বন্ধ না করলে আগামী দিনে যে তা দাবানলের মতো শিক্ষার উচ্চতর অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়বে না, তা কে বলতে পারে?

উচ্চমাধ্যমিক টেস্টে অনুত্তীর্ণদের হামলার প্রতিবাদ জানাল অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি

উচ্চমাধ্যমিক টেস্টে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে বিভিন্ন স্কুলে হামলা চালাচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তালাবদ্ধ করে রাখছে, তার তীব্র নিন্দা করেছে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি। কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা ২২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এই ধরনের ঘটনার পেছনে বহু ক্ষেত্রে শাসক দলের লোকজনের উস্কানি রয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃপক্ষ যেভাবে তাদের এক্তিয়ার বহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে তাতে এই উস্কানি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়েছে। পরিণতিতে শিক্ষার মানের এই ভয়াবহ অবস্থা, যা রুখতে না পারলে আগামী দিনে আরও সর্বনাশ হবে। তিনি জানান, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাকে সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ৬ জানুয়ারি কলকাতায় এক শিক্ষা কনভেনশন আহ্বান করা হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক পবিত্র গুপ্ত, অধ্যাপক মীরাতুন নাহার প্রমুখ।

দিল্লি ঃ জনগণের দাবি মেনে নিতে হবে

— প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন,

আশা করা গিয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় ও দিল্লির সরকার ধর্ষিতা মেয়েটিকে তাঁর জীবনের এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থতার জন্য তাঁর কাছে ও দিল্লির সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং তাঁদের আশ্বস্ত করবে যে, ভবিষ্যতে এমন ঘৃণ্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমরা হতবাক হয়ে দুই সরকারকেই সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় দেখলাম। সমাজের সকল অংশের সাধারণ মানুষ যারা রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ বিশাল সমাবেশে সামিল হয়ে এই অপরাধের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ন্যায্য দাবি তুলছিল, দিল্লি পুলিশ তাদেরই উপর জলকামান, টিয়ার গ্যাস ও লাঠি নিয়ে নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই বর্বর পুলিশি অত্যাচারের আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং দাবি জানাচ্ছি, সমগ্র দেশের জনগণের দাবি মেনে সরকার অবিলম্বে তার দায়িত্ব পালন করুক।

আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি যে, দিল্লি সহ সারা দেশের সমস্ত শাসক দলগুলিই মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ। ফলে সারা দেশেই এই ধরনের নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে মহিলাদের জীবন ও সম্মানের বস্তুত কোনও নিরাপত্তাই নেই। একদিকে দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছাত্র-যুবক ও সাধারণ মানুষের মানবিকতা ও মূল্যবোধ হরণ করছে। যার ফলে এদের এক বিরাট অংশ অপরাধ জগতের শিকারে পরিণত হচ্ছে, আর অন্যদিকে এইসব অপরাধ দমন করতে কোনও কঠোর পদক্ষেপ না নিয়ে সরকারগুলিও এইসব অপরাধ ও অপরাধীদের পক্ষান্তরে মদত জুগিয়ে চলেছে। এইরকম এক পরিস্থিতিতে দিল্লির ছাত্র যুবক ও সাধারণ মানুষ সমস্ত আক্রমণকে উপেক্ষা করে যেভাবে এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমরা আশা রাখি, সারা দেশের ছাত্র-যুব-সাধারণ মানুষ একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কেন্দ্র ও দিল্লি রাজ্য সরকারকে তাঁদের দাবি মানতে বাধ্য করবেন।"

---

২০ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামল এক বিবৃতিতে দিল্লির গণবিক্ষোভকে অভিনন্দন জানিয়ে অবিলম্বে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

১৬ ডিসেম্বর রঘুনাথপুরে ডিভিসি-র বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে জমিহারা মানুষদের সংগঠন আরটিপিএস ল্যান্ড লুজার্স অ্যাসোসিয়েশন স্থায়ী চাকরি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী জোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং মন্ত্রী দীপা দাসমুন্সির সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ডিভিসির চেয়ারম্যান বিক্ষোভকারীদের স্মারকলিপি গ্রহণ করে দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

দিল্লির আন্দোলনের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্য রাজ্যে এস ইউ সি আই (সি)

কেরালা হাজরা কলেজ স্ট্রীট মুর্শিদাবাদ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in